স্বাধীন মনের ঋত্বিক

কুমার রায়

একটা স্বাধীন মনের অধিকারী ছিল ঋত্বিক

ঋত্বিক আমাকে ‘বহুরূপী’ সংগঠনে নিয়ে আসার ব্যাপারে, শম্ভু মিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার ব্যাপারে একটা উপলক্ষ হয়েছিল। কিন্তু সে তো ১৯৪৮ সালের শেষে। তার আগে তার সঙ্গে সহপাঠী হিসেবে আমার পরিচয এবং বন্ধুত্ব সেই ১৯৪৫ সালে রাজশাহী সরকারি মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে। ও অবশ্য কলা শাখার ছাত্র আর আমি বিজ্ঞান শাখার। ওর বাড়ি তখন রাজশাহীতেই -- বাবা, মা, ভাই, বোনদের সঙ্গে থাকে। আমি এক মিশনারি ছাত্রাবাসে। তাতে কিছু এসে যায়নি। মহাবিদ্যালয়ের চত্বরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নানা উপলক্ষে সংস্কৃতিমনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে সময় লাগেনি।

বিশেষ করে নাটক সম্পর্কে আমাদের দু’জনের আগ্রহ আমাদের আরও কাছাকাছি এনেছিল আমার মাঝারি উচচতা এবং ওর ঢ্যাঙা চেহারায় অবশ্যই তফাত ছিল। ওর চোখের চাহনির ঔজ্জ্বল্য আর ঠোঁটের বাইরের রেখায় আঁকা ছবির নির্দিষ্টতা নিয়ে ও অবশ্যই ব্যতিত্রম ছিল; আর কথা বলার ধরনেও একটা তীক্ষ্নতা ছিল যা ওকে একটু স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল ছাত্রমহলে। যতদূর মনে আছে ঋত্বিক ইংরিজি সাহিত্যে সাম্মানিক শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তখন সেখানে ইংরিজি বিভাগে ছিলেন ড. সুবোধ সেনগুপ্ত মশায়। তা সুবোধবাবুর সংস্কৃতিচর্চা এবং নাট্যচর্চায় উৎসাহদাতা হিসেবে ছাত্রমহলে খ্যাতি ছিল---বিশেষ করে রবীন্দ্রনাটকের ব্যাপারে। আমরা একবার রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ নাটকের মহলা দিতে শু করি। ড. সেনগুপ্ত তখন উপ-অধ্যক্ষ। আমাদের কলেজের অনুষ্ঠান বলে সে অভিনয় কলেজের প্রেক্ষাগৃহে করবার অনুমতি দিলেন। ঋত্বিক নিল ‘ঠাকুর্দা’ চরিত্র, আমি ‘অদৃশ্য রাজা’ আর সুনীল সিদ্ধান্ত ‘রানী সুদর্শনা’। কিন্তু সে নাটক শেষ পর্যন্ত করা যায়নি, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলে ছাত্রদের একাংশ সে অভিনয় বন্ধ করেদিয়েছিল। ছেচল্লিশ সালের সাম্প্রদায়িক অবস্থাটা তো খুব একটা সুখকর ছিল না। ড. সেনগুপ্তকে তখন আমাদের জন্য অনেক ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়েছিল। আমাদের সকলের খারাপ লেগেছিল--- কিন্তু কিছু করার ছিল না। ঋত্বিক স্থানীয় ছেলে বলে ওর স্থানীয় বন্ধুবান্ধব ছিল। তাদের নিয়ে তখন থিয়েটারের মহরা চলল। এবং স্থানীয় একটি নাট্যগৃহে নাটক হল। পরে আবারও রবীন্দ্রনাটক করা হয়েছিল---‘পরিত্রাণ’। ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় ঋত্বিক এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় আমি। নৃপেন ছিল আমাদের দলে, সে ঋত্বিকের স্থানীয় বন্ধু--- সে একটি স্ত্রী ভূমিকায়, এবং হঠাৎ এসে যাওয়া আর এক বন্ধু (ড. সুবোধ সেনগুপ্তের ভাগ্নে) কালী দাশগুপ্ত অন্য এক স্ত্রী ভূমিকায় নেমেছিল মনে আছ্যে এই কালী দাশগুপ্ত এবং ‘অদৃশ্য রাজা’ নাটকের রানি সুদর্শনা চরিত্রের অভিনেতা সুনীল সিদ্ধান্ত পরবর্তী জীবনে একজন প্রখ্যাত লোকসংগীত গায়ক রূপে দেশেবিদেশে খ্যাত, আর - একজন রসায়নশাস্ত্রের নামী অধ্যাপক। আর ঋত্বিক আপন প্রতিভাবলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার। বোঝা যাচ্ছে বাঁধ, মাছ, নৌকো, আর সাধারণ মানুষ, আর মহাবিদ্যালয়ের বিশাল মাঠ, মাঠ ঘিরে আলাদা আলাদা বিভাগীয় সুন্দর কাকার্য করা লাল রঙের ইমারতগুলি আমাদের মনে একটা দাগ কেটেছিল আর তারপরেই তো দেশ ভাগ, দাঙ্গা, আর স্বাধীনতা। ছিন্নমূল হয়ে কে কোথায় ভেসে গেল। ঋত্বিকের সেই সংবেদনশীল মনে এই দেশ ভাগ, পদ্মানদীর জল,

চিরকালের জন্য একটা ছাপ ফেলে গেল। যা ঘটে গেল তা পাগলের কাণ্ড বলেই মনে হল তার। যে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুটাই হারিয়ে গেল। এই খ্যাপামির ছোঁয়া যেন ঋত্বিকের ব্যক্তিজীবনে এবং তার শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও ফুটে উঠল। পদ্মানদীর ওপার থেকে ওপারে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাওয়া এপার থেকে ওপারে সবুজের হাতছানি অনুভব করা। হয়তো এসবের মধ্যে ঋত্বিকের মনটা স্থিতু হতে পারল না। স্থিতু হলে ছবি করাও হত না। এই অস্থির মনটাই যেন তার সকল কাজে প্রতীয়মান হল।

সেই সাতচল্লিশ সালেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ১৯৪৮ সালের পুজোর ছুটির পর কলকাতা ঝিবিদ্যালয়ের সামনে আমি দাঁড়িয়ে, এমন সময় রাস্তার ওপারের ফুটপাতে কলেজ স্কোয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে ঋত্বিক, আমাকে দেখে ডেকে উঠল। তাকাতেই দেখি গেয়া পাঞ্জাবি পরা, চশমা পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, ঋত্বিক আমাকে ডাকছে। অনেকদিন পর আবার দেখা। উৎফুল্ল হয়েই ওপারে গেলাম। পরিচয় করিয়ে দিল ঋত্বিক শম্ভু মিত্রের সঙ্গে। দূর থেকে ওঁকে একদিন 'মধুবংশীর গলি' কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেছি। আর জানি তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘ - প্রযোজিত সেই ১৯৪৪ সালে ইতিহাস সৃষ্টিকারী 'নবান্ন' নাটকের অন্যতম পরিচালক। আবৃত্তি শুনে কণ্ঠস্বরের জাদুতে আগেই মজেছিলাম--- এবার কথা বলায় গলার কাকার্য অনুভব করলাম। ঋত্বিক আমাকে বললে যে তারা একটা নতুন নাটকের দল করছে, ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে তিনদিন সেই নবান্ন নাটকটি এই নতুন দলের গঠনপর্ব রঙমহল মঞ্চে অভিনীতও হয়েছে। শম্ভু মিত্রের কাছে পরিচয় দিতে গিয়ে আমার কলেজে আবৃত্তি এবং রাজশাহীতে সেই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে ঋত্বিক সবিশেষ বলেছিল সেদিন। শম্ভু মিত্রও আমাকে এই দলে যোগদানের অনুরোধ জানালেন। ঠিক হল ঋত্বিক কোনো একদিন আমাকে পার্ক সার্কাসে ওঁদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। সেদিন বসন্ত কেবিনে বসে চা খাওয়া হল। ঋত্বিক আমাদের বসিয়ে রেখে চট্ করে ঝিবিদ্যালয়ে তার তখনকার একটি শ্রেণীতে উপস্থিতি জাহির করে চলে এল। আমি সেই মধ্যবর্তী সময়ে আঠা হয়ে লেগে থাকলাম শম্ভু মিত্রের সঙ্গে। সেই আঠাটা হল নাটকের আঠা। সেই আঠাটার মধ্যে, কোনো সময়ে নিষেধের দংশানির চোটটা রয়েই যায়--- আর যাকেএ ছোবল খেতে হয়েছে সে তো নিস্কৃতি পায় না। ততক্ষণে শম্ভু মিত্র শম্ভুদা হয়ে গেছেন। ঋত্বিক সেই বসন্ত কেবিনেচা খেতে খেতে তার সদ্য লেখা 'দলিল' নাটকটির খসড়া খানিকটা পড়ে শোনাল। সে যে নাটক লিখত তা জানতাম। রাজশাহীতে সেই ১৯৪৫ - ৪৬ সালে নাটকের মতো করে লেখা একটা খসড়া আমাদের শুনিয়েছিল। তাতেনেপথ্য ভাষণ- এর সঙ্গে দৃশ্য সংযোজন করা ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বর্মা সীমান্ত অভিযান, ইত্যাদি দৃশ্য ছিল। অভিনয়, নেপথ্য ভাষণ, সূত্রধর, আলো, শব্দ, সংগীত নিয়ে একটি আলেখ্য। বেশ জমাটি ব্যাপার। কিন্তু সেটা করা যায়নি। হয়তো পরে ঋত্বিক ওই বিষয়টি নিয়ে আর কাজ করতে চায়নি। কেননা সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে তখন টানাপোড়েন চলেছে।

প্রতিবন্ধী আমাদের এই স্বাধীনতা নিয়ে ঋত্বিকের মনেও আমাদের মতোই ক্ষোভ ছিল--- কিন্তু ঋত্বিক সেইক্ষোভে ফেটে পড়তে পারত। বিস্ফোরক কথাবার্তা উচচারণ করতে দ্বিধা করত না। সেটা অনেকসময়েই আমাদেরঅস্বস্তিতে ফেলে দিত। নেতাদের সম্পর্কে বিশেষ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে 'বরাহ নন্দন' প্রাকৃত বাংলাটি উচচারণ করত। জ্বালাটা ওই দেশভাগজনিত এবং তখনকার 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' ঘোষণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং এসবই 'বহুরূপী'র পরবর্তী অধ্যায়।

বহুরূপীতে দল গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগে ঋত্বিক সহযোগী ছিল এবং ১৯৪৮ সালে সেই 'নবান্ন' নাটকেরপুনরাভিনয়ে অভিনয়ও করেছিল। সে কথা বলেছি আমার সঙ্গে পথে শম্ভুদার পরিচয় ঘটানোর সূত্রে। তখনও নামকরণ হয়নি। ঋত্বিকের সঙ্গে একদিন ১১-এ নাসিদ্দিন রোডে এলাম--- পরিচয় হল সকলের সঙ্গে। মহর্ষিকে দেখলাম, তুলসী লাহিড়ীকে দেখলাম। আর শম্ভুদার সঙ্গে তো আগেই পরিচয় হয়েছে। ওই বাড়িতেই ওঁরা থাকতেন। ঋত্বিক তৃপ্তি মিত্রকে মণিদি বলত। আর যেহেতু সেই আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল তাই ওর দেখাদেখি আমিও মণিদি বলতে শু করি। সেই সময় ভবা (ঋত্বিকের ডাক নাম) একদিন টালিগঞ্জে রসা রোড সাউথ সেকেন্ড লেন কিংবা থার্ড লেনে বিজন ভট্টাচার্যের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেল ও পরিচয় করিয়ে দিল। 'নবান্ন'র নাট্যকারের সঙ্গে সেইসাক্ষাৎ পরিচয়। ঋত্বিকের সঙ্গে বিজনদা আত্মীয়তার সূত্রে জড়িত। বিজনদার স্ত্রী মহাশ্বেতা দেবী ঋত্বিকের বড়ো দাদা মণীশ ঘটকের মেয়ে। আবার গোষ্ঠদা। (বিজন ভট্টাচার্যের ডাক নাম) তৃপ্তি মিত্রের মামাতো দাদা। তিনি তৃপ্তিকে মণি বলে ডাকেন। সেটাই তার ডাক নাম। সেই

সূত্রেই ঋত্বিকের মণিদি সম্ভাষণ। অথচ আমরা সকলেই প্রায় একবয়সী--- দু-চার মাসের তফাত বয়সের দিক থেকে। যাই হোক, ঋত্বিকের সুবাদেই আমি বহুরূপী পরিবারের অন্তর্ভুক্তহয়ে গেলাম। ঋত্বিক কিছুদিনের মধ্যেই দলছাড়া হয়ে গেল। মনে আছে 'পথিক' নাটকের মহলায় কোলিয়ারির একদল শ্রমিকের ভূমিকায় মহম্মদ ইস্রাইল, ঋত্বিক, কলিম শরাফি, অমর এবং আমি বেশ কিছুদিন মহলা দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইসরাইল, অমর এবং আমি রয়ে গেলাম। ঋত্বিক দল ছেড়ে গেল আর কলিম পূর্ব পাকিস্তানে জীবিকার জন্য যেতে বাধ্য হল। সেই মহরা পর্বেই একদিন আমাকে বিস্মিত কর ার ঘটনা ঘটল। ব্যাপারটা এমনিতেকিছুই নয় হয়তো, আবার আমার মতো মধ্যবিত্ত সংস্কারাচ্ছন্ন মনের কাছে কিছু তো বটে। শম্ভুদাদের সেই বাইরের ঘরটাই ছিল মহরার ঘর। মহর্ষি একটা উঁচু জায়গায় বসে আছেন--- সেই সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি, আর খদ্দরের ধুতি(আধখানা কেটে পরা)--- আমরা নীচে বসে। হঠাৎ মহর্ষি বললেন, 'কই হে ঋত্বিক খুব স ম্প্রতিভ হয়েই পকেট থেকে একটা বড়ো মাপের বিড়ি মহর্ষির হাতে দিল। মহর্ষির চাওয়া এবং ঋত্বিকের দেওয়াটা আম াকে বিমূঢ় করে দিল।জানি না কতকগুলো ট্যাবুকে ভাঙবার জন্যেই--- কিংবা কামারাদেরি-র পদ্ধতি এটা বুঝতে পারিনি তখন। মহর্ষিকে তার পরেও খুব যে একটা বিড়ি - সিগ্রেট খেতে দেখেছি তা তো নয়, হ্যাঁ কালেভদ্রে নিশ্চয়ই খেতেন।
ঋত্বিক নিশ্চই ততদিনে এই প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সপ্রতিভতাও ওর একটা গুণ ছিল।
দু'জন নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয ঘটিয়ে দেবার সেতু হয়ে রইল ঋত্বিক আমার জীবনে। সেইসঙ্গে বহুরূপী ছেড়ে দেওয়ার পর ও যখন খুব ব্যস্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের শিক্ষানবিশ হিসেবে, টালিগঞ্জ -এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর্বেতখন 'ছিন্নমূল' হয়ে গেছে---ও সে কাহিনীচিত্রে অভিনয়ও করেছিল আর বোধহয় সেই সময়ই বিমল রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে 'তথাপি' ছবি তোলা শু হচ্ছে--- তখন একদিন বিমল রায়ের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয করিয়ে দিয়েছি। 'তথাপি'র সূত্রেই একদিন কি দু-দিন ভাগ্যলক্ষ্মী পিকচার্সের স্টুডিওতে ছবি তোলা দেখবার সুযোগ হল। সেই প্রথম। ঋত্বিক তখন ব্যস্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের শিক্ষানবিশিতে।
'বহুরূপী' ছেড়ে চলে গেলেও আমার সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়ে গেল। তারপর তো রক্সি সিনেমায় ওর করা 'বিসর্জন' দেখলাম। দেখলাম ওর সেই 'দলিল' নাটকটির প্রযোজনাও। এসব পঞ্চাশের দশকেই। ১৯৫৫সালে বোধকরি ওর সঙ্গে আই. পি. টি. এ. - এর সম্পর্ক ছিন্ন হল এবং সঠিক মনে করতে পারছি না--- সেই সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ও ওর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। সেই সময় থেইে নাটকের সঙ্গে কিছুটা শিথিল হল বন্ধন। বাঁধাপড়ল ঋত্বিক চলচ্চিত্রের সঙ্গে। তারই একটি কথা স্মরণ করি--- "সিনেমা লাখ লাখ লোককে একসঙ্গে একবারে মোচড় দিতে পারে।" আবার এও বলত --- ফিল্মের প্রতি তার আলাদা কোনো ভালোবাসা নেই, এর থেকেও ভালো কোনো মাধ্যম পেলে তাতেই সে অ াত্মপ্রকাশ করবে। একটা স্বাধীন মনের অধিকারী ছিল ঋত্বিক। তাই পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের আগে যে প্রতিবেদন সে পা ঠিয়েছিল ১৯৫৪ সালে তাতে অনায়াসে উচচারণ করেছিল A Communist group will have to be mobile, and at the same time be capable of maintaining quality in a settled place, a working knowledge, of these technical aspects will be helpful. The group must be understood so that the individual may flowerize. The seeming contradiction of collective and individual is nonexistent. It is all for one and one for all.
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের এই সময়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকাকালীনই তার প্রথম ছবি 'নাগরিক'। ওই আন্দোলনের সঙ্গে, তার স্বাধীন মনের সঙ্গে, বাস্তব অবস্থার দ্বন্দ্বে - তর্কে জড়িয়ে যেতে যেতে বা বিচ্ছিন্ন হতে হতেই মাঝে নাঝে থিয়েট ারে ফিরে এসেছে বা ফিরে আসার আকাঙক্ষা প্রকাশ করেছে। মাঝখানে বোম্বাইয়ে ফিল্ম জগতের কাজে মিশে যাওয়া। ১৯৫৬ সালে অনেকদিন বাদে তার সঙ্গে আমার দেখা সেই বোম্বাইয়ে। ইতিমধ্যে ১৯৫৫ সালে বিয়ে হয়েছে সুরমা ভট্ট াচার্যের সঙ্গে। গঙ্গাদা (গঙ্গাপদ বসু) ও আমার নেমন্তন্ন ছিল ওর বাড়িতে বোম্বাইয়ে। গঙ্গাদা গিয়েছিলেন--- আমার য াওয়া হয়নি বহুরূপীর কাজের জন্য বোধহয় এটাই নিয়ে বহুদিন ওর ক্ষোভ ছিল..
১৯৭০ সালে আবার পরপর দেখা হল ওর সঙ্গে। তখন বোধহয় স্বল্পদৈর্ঘ্যের দুটো ছবি সে করছে --- 'পুলিয়ার ছৌ' এবং 'আমার লেনিন'। আকাডেমিতে আমাদের 'বাকি ইতিহাস' এবং 'ডাকঘর' অভিনয় দেখতে এসেছিল। অনেকদিন পর স াজঘরে শম্ভুদার সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে ওর দেখা হল। অনেক কথার মধ্যে শিল্পী জীবন নিয়ে, শৃঙ্খালাহীনতা নিয়ে কী কথা উঠতেই শম্ভুদা ঋত্বিককে বেশ তিরস্কারের ভঙ্গিতেই বলেছিলেন--- 'ভুলে যাচ্ছোকেন---আমাদের সামনে রবীন্দ্রন

াথও আছেন।’

‘সাঁকো’, ‘জ্বালা’ এবং ‘সেই বিষুওপ্রিয়া’ কে নিয়ে যে নাটক তা এই পর্বেই দেখি। ঋত্বিককে আবারও থিয়েটারের মানুষ হিসেবে চিনে নেওয়া গেল। ভিতরে ভিতরে সেই নাটকের হাতছানি কি সে দেখত-- হয়তো সে হাতছানিছিল--- নইলে একদিন সকালে পাম অ্যাভিন্যুতে আমার ছেলেকে পাঠভবনের ছোটোদের বিভাগে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়ার পথে বাহাদুর খাঁ-র বাড়ির সামনে দেখা হওয়ার সময় কেন বলবে, ‘চল্ আবার বিসর্জন নাটকটা করি---তুই জয়সিংহ আর আমি রঘুপতি।’ মনে হল সেই রাজশাহীর দিনগুলোয় যেন ফিরে গেলাম আমরা। পরপর বেশ-কদিন ওই বাহাদুর খাঁর বাড়ির সামনে দেখা--- তখন বোধহয় সেই সেতার নিয়ে ওর স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির সংগীত রচনা করাচ্ছে। কী জানি সেই সময়ে দেশের সমকালের সংকটের ছবি খুঁজে নিতে ‘বিসর্জন’ নাটকটির ভাবনা তার মাথায়এসেছিল কি না। ১৯৬১ সালে যখন শম্ভুদা বহুরূপীতে ‘বিসর্জন’ নাটক করেন তখন তো সেই সময়ের মধ্যেই প্রাসঙ্গিকতা খুঁজেছিলেন তিনি। ঋত্বিকও কি কোনো প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পেয়েছিলেন বিসর্জন নাটকের মধ্যে সেই সত্তরেরদশকের শুতে? চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কেই তার এই উক্তিটি যে মূল্যবান--- “আমি বিশ্বাস করি না যে আমার কোনো শিল্পকর্ম করার অধিকার আছে, যদি না আমার দেশের এই সংকটকে কোনো-না-কোনো দিক থেকে উদ্‌ঘাটিত করে তুলতে পারি।”

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com